বাংলাদেশের রক্তাক্ত পোশাক শিল্পঃ মালিক ও সরকারের দায়মুক্তি

তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড ট্রাজেডি

অধিকার প্রতিবেদন

প্রকাশকাল ৫ ডসিম্বের ২০১২

ভূমিকা:

আশির দশক থেকে বাংলাদেশে অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছে তৈরী পোশাক শিল্প। বর্তমানে প্রায় ৩৫ লক্ষ শ্রমিক ৫০০০ কারখানায় কাজ করছেন, যাঁদের মধ্যে ৮০ ভাগই নারী। তৈরী পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, যা অর্থনীতিকে গতিশীল রেখেছে। গত ২০১১-১২ সালে এই শিল্প খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[১]

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই খাত তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য কম। যার দরুন বিদেশী ক্রেতারা এদেশে ভীড় জমিয়েছে। এই স্বল্প বেতনের শ্রমিকদের মানবাধিকার বিভিন্ন ভাবে লঙ্ঘন করছে কারখানার মালিকরা। এই শিল্পে রয়েছে এক অবাস্তব বেতন কাঠামো, যেখানে সর্বনি¤œ মজুরী প্রতিমাসে মাত্র ৩৫০০ টাকা, যা দিয়ে একজন শ্রমিকের জীবন ধারণ একেবারেই দুঃসাধ্য। অনেক কারখানাই বেতন, ওভার টাইম এর টাকা বা উৎসব ভাতা শ্রমিকদের ঠিকমত দেয়না; শ্রমিকদের ছাঁটাই এর ক্ষেত্রে অনেক কারখানাই শ্রম আইন লঙ্ঘন করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের জন্য নেই কোন চিকিৎসা সুবিধা বা তাঁদের সন্তানদের জন্য দিবাযতœ কেন্দ্র। নারী শ্রমিকদের প্রসব পরবর্তীকালীন ছুটি ছয় মাস করতে বাধা দিচ্ছে পোশাক মালিকদের সমিতি ‘বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ। মালিকদের জন্য সমিতি বিজিএমইএ থাকলেও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে না দিয়ে তাঁদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। কারখানাগুলোর অবকাঠামোগত ত্রুটি, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার ত্রুটি বা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ না দেয়া - এই সবই হলো শ্রম আইন ২০০৬ এর লঙ্ঘন। ফলশ্রুতিতে শ্রমিকরা অপুষ্টি, অনাহারে, চিকিৎসার অভাবে ধুঁকছেন, মরছেন আগুনে পুড়ে বা পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে। আর অসন্তুষ্ট, উত্তেজিত শ্রমিকদের অসন্তোষ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, টিয়ার সেল ছুড়ে দমন করা হচ্ছে মালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী শিল্প পুলিশ বাহিনী দিয়ে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে গড়ে উঠছে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য।

কারখানায় বার বার আগুন:

তৈরী পোশাক শিল্পকারখানাগুলোতে বারবার আগুন লাগছে, শ্রমিক পুড়ে মরছে, আহত হচ্ছে। গত ২৪ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার নিশ্চিন্তপুরে তোবা গ্রুপের তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এর ৯তলা ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এই অগ্নিকান্ডে ১০০ এর বেশী শ্রমিক নিহত ও শতাধিক শ্রমিক আহত হন। জানা যায় এই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১১৬৩ জন।

---

[১] সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

আগুন লাগার পর তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড ভবন (ছবিঃ অধিকার)

- এ ঘটনার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির হিসাব অনুযায়ী ১১১ জনের লাশ পাওয়া গেছে।
- ফায়ার সার্ভির্স ও সিভিল ডিফেন্স এর হিসাব অনুযায়ী ১০০টি লাশের হিসাব পাওয়া গেছে।
- তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এর হিসাব অনুযায়ী লাশ পাওয়া গেছে ১১১টি।
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-১ এর হিসাব অনুযায়ী লাশ পাওয়া গেছে ১১৩টি ।
- ১১৩ জনের লাশ পাওয়া গেলেও অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন।
- ৪ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজন শ্রমিক রাজধানীর এ্যাপোলো হাসপাতালে মারা গেছেন। নিহত শ্রমিকের সংখ্যা আরো অনেক বেশী বলে অধিকার মনে করছে।

জুরাইন কবরস্থানে লাশের সারি। (সৌজন্যেঃ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম)

গত ২ জুন ২০১২ সালে গাজীপুরের কোনাবাড়ীর ইসলাম গার্মেন্টস কারখানায় আগুনে পুড়ে আহত হন ১৫ জন শ্রমিক। ২০১০ সালেও দুটি বড় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ২০১০ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের গরীব এ্যান্ড গরীব সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকান্ডে ২১ জন শ্রমিক মারা যান। একই বছর ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে হা-মীম গ্রুপের গার্মেন্টস কারখানায় পুড়ে মারা যান ২৯ জন শ্রমিক। ২০০৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের কেটিএস কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলে আগুন লাগলে ৯১ জন শ্রমিক পুড়ে মারা যান। ওই বছরের ৯ই ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের যমুনা স্পিনিং মিলে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় নিহত হন ৬ জন। একই বছরের মার্চ মাসে সায়েম ফ্যাশন লিমিটেডে আগুনে পুড়ে ৩ মহিলা শ্রমিক মারা যান। ২০০৫ সালের ৭ই জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টস কারখানায় আগুনে পুড়ে ২২ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে নরসিংদীর শিবপুরে গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লেগে ৪৮জন শ্রমিক নিহত হন। ওই বছরের ৩রা মে মিসকো সুপার মার্কেট কমপ্লেক্সের একটি গার্মেন্টসে আগুন লাগলে ৯ জন শ্রমিক মারা যান। ২০০০ সালের ২৫শে নভেম্বর নরসিংদীর চৌধুরী নিটওয়্যার অ্যান্ড গার্মেন্টস লিমিটেডে আগুনে পুড়ে মারা যান ৫৩ জন শ্রমিক। ১৯৯০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সারেকা গার্মেন্টসে আগুনের ঘটনায় মৃত্যু হয় ৩০ জনের।[২] তৈরি পোশাক ফ্যাক্টরীগুলোতে আগুন লাগার পেছনে প্রায় গার্মেন্টেস ফ্যাক্টরীর মালিক এবং সরকার পক্ষ থেকে এক ধরনের ‘ষড়যন্ত্র তত্ব’ হাজির করা হয়। অথচ শ্রমিকদের নূন্যতম বেতন-ভাতা, ওভার টাইম সুবিধা, সর্বোপরি অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার এবং ফ্যাক্টরীর কাঠামোগত বিষয়ের উন্নয়নের প্রশ্ন আসলেই তাঁরা যেন নিশ্চুপ হয়ে পড়েন এবং প্রতিবাদী শ্রমিকদের কঠোরভাবে দমনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বাহিনীসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করেন। এই অবস্থার প্রতিকার না হলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটি ব্যাপকভাবে হুমকির সম্মূখীন হবে, যা মূলত: দেশের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র হিসেবে এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমজীবি মানুষ এর দেশের জনসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের ইতিহাসের ভয়াবহতম অগ্নিকান্ডের এবং তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এর অবকাঠামোগত অবস্থা

তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড কোনোভাবেই শ্রমিকের কর্মপরিবেশ উপযোগী বা যথাযথ মান বহনকারী কারখানা ছিল না। কারখানার ভবন নির্মাণে ন্যূনতম ভবন নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করা হয়নি। আগুন লাগার পর অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলোও কাজ করেনি। ৩টি সিঁড়ি থাকলেও সেগুলো একতলার গুদাম ঘরে এসে নেমেছিল। অথচ কারখানা থেকে সিড়ি গুলো জরুরী বহির্গমন পথ হিসেবে বাইরের দিকে বের হবার কথা। এ নিয়ে এ পর্যন্ত পৃথকভাবে ৪টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া কারখানার চারপাশে পরিমাণ মত জায়গা ছিল না যেখানে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা কাজ করতে পারবে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে, আগুনের সতর্ক সংকেত বাজার পরও কারখানার মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকেরা শ্রমিকদের কারখানা ত্যাগে বাধা দিয়েছেন। তাঁরা জোরে গান বাজিয়ে দেন যাতে শ্রমিকরা সর্তক সংকেত না শুনে কাজে নিয়োজিত থাকেন। ফলে প্রাথমিকভাবে

[২] মানবজমিন; নভেম্বর ২৭, ২০১২

আগুন দেখার পরও তা নিয়ন্ত্রণের জন্য একদিকে যেমন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি, তেমনি অন্যদিকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা মালিকপক্ষের লোকজন শ্রমিকদের নিরাপদে বের হবার সুযোগ না দিয়ে শত শত শ্রমিককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। কারখানার নয়তলা ভবনটির নিচতলার পুরোটাই ছিল গুদাম বা ওয়্যার হাউস। এখানে সুতা ও কাপড় গুদামজাত করা হতো। নিচতলার ওয়্যার হাউসে আগুন লাগায় এবং সেখানে সিনথেটিক জাতীয় সুতা, কাপড়ের বিশাল মজুদ থাকায় আগুন লাগার পরপরই পুরো ভবনটি ইটভাটার মতো রূপ নেয় এবং সিঁড়িগুলো হয়ে ওঠে উত্তপ্ত চিমনি। নিচতলার ভয়াবহ আগুনের তাপ, শিখা ও কালো ধোঁয়া তিনটি সিঁড়ি দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়। ফলে শত শত কর্মব্যস্ত শ্রমিকর প্রচন্ড কালো ধোঁয়ায় বের হবার কোন পথ না পেয়ে দম বন্ধ ও পরবর্তী সময়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। কারখানার নিচতলায় কোনো ধরনের ওয়্যার হাউস থাকার বিধান না থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। ফলে আগুন থেকে অনেক বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। কোনো ধরনের বহির্মুখী জরুরী নির্গমন পথ অথবা বিকল্প সিঁড়ি না থাকায় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলার শ্রমিকেরা লোহার গ্রিল, কাঁচ, একজস্ট ফ্যান ভেঙে জীবন বাঁচাতে পাশের টিনের চালে লাফিয়ে পড়েন। এ কারণেও হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে।

প্রাথমিকভাবে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী ৫০জন আহত রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ২ জনকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে মৃতের সংখ্যা অনেক। অনেক শ্রমিক অভিযোগ করেছেন, মৃতের সংখ্যা যত কমানো যাবে, ততই কম ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বিধায় সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংগঠন বিভ্রান্তি মূলক তথ্য ছড়াচ্ছে।

শ্রমিক অসন্তোষ:

তাজরীন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে আগুনে পুড়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর প্রতিবাদে, এর মালিক ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি এবং অন্যান্য গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের ছাঁটাই এর প্রতিবাদে গত ২৮ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত আশুলিয়া, টঙ্গী ও সাভারে কয়েক হাজার শ্রমিক রাস্তায় নেমে আসেন এবং সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ হামলা চালালে পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিক্ষুদ্ধ শ্রমিকরা গাড়ী ভাংচুর করেন এবং আগুন ধরিয়ে দেন। গত ২৮ নভেম্বর আশুলিয়াতে বিক্ষোভ চলাকালে ৫০ জন শ্রমিক আহত হন।[৩] ১ ডিসেম্বর ২০১২ তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের শ্রমিকরা ৪ মাস ১৩ দিনের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৫জন শ্রমিক আহত হন।[৪] ২ ডিসেম্বর ২০১২ জামগড়ায় হিউয়েন অ্যাপারেলস এর ১০১ জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তালিকা প্রকাশের জের ধরে শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রর্দশন করেন। সংঘর্ষে শতাধিক শ্রমিক, পুলিশ ও সাংবাদিক আহত হন।[৫] গত ০৩ ডিসেম্বর তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড

[৩] নিউ এজ ২৯/১১/১২
[৪] নিউ এজ ২/১২/১২
[৫] যায়যায়দিন ৩/১২/১২

এর শ্রমিকদের মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং হিউয়েন অ্যাপারেলস এ শ্রমিকদের ছাটাইয়ের জের ধরে সংঘর্ষে ৫০ জন শ্রমিক আহত হন।[৬]

ক্ষতিপূরণ:

৫ ডিসেম্বর ২০১২ এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারী হিসাব মতে নিহত ১১২ জন শ্রমিকের মধ্যে ৪৩ জন শ্রমিকের প্রতিটি পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা করে হস্তান্তর করেন। ক্ষতিপুরণের ৬ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা, বিজিএমইএ এর পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা, শ্রম মন্ত্রণালয় এর পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা, বিদেশী ক্রেতা লি অ্যান্ড ফাং প্রতিষ্ঠান থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিএবি) এর পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে।

শিল্প মালিক ও সরকারের দায়মুক্তি

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে তৈরি পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনায় অনেক শ্রমিক হতাহত হলেও দুর্ঘটনা কবলিত কারখানাগুলোর মালিকদের কখনই কোন বিচারের আওতায় আনা হয়নি। এই শিল্প কারখানাগুলোর মনিটরিং এর দায়িত্বে থাকা ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর বা সরকারী কর্মকর্তাদেরও কোন বিচার হয়নি। ফলে অবহেলা ও অন্যায়ের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় এই জাতীয় দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। এছাড়া শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামকে গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িতদেরও বিচার হয়নি। শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে ছাঁটাই, বেতন ভাতা না দেয়ার সঙ্গে জড়িত অনেক মালিকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এই ক্ষেত্রে শিল্প মালিক ও সরকারের দায়মুক্তি প্রকট।

অধিকার এর সুপারিশ

১. তাজরীন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর স্থাপনা, গুদামঘর এর অনুমোদন দেয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট গার্মেন্টস মালিক, ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের হতে বাধাদানকারী এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলদের দায়ী করে হত্যা মামলা দায়ের করতে হবে।

২. তাজরীন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে নিহতদের সঠিক তালিকা প্রকাশ করতে হবে ও শুধুমাত্র ৬ লক্ষ টাকা দিয়ে এই দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। নিহতদের অনূর্দ্ধ ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের দায়িত্ব বিজিএমইএ ও সরকারকে নিতে হবে ও পরিবারের অন্য সদস্য যাঁরা নিহতদের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁদের সুরক্ষা দিতে হবে।

৩. আহতদের সঠিক তালিকা প্রকাশ করতে হবে। আহতদের চিকিৎসা বিজিএমইএ বা সরকার কোথায় কিভাবে করাচ্ছে তা জনগণকে জানাতে হবে ও আহতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ঘটনার পর অনেক শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিকদের শিশুরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এখনও আগুন আতঙ্ক অনেককে তাড়া করছে। তাঁদের মনোচিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

---

[৬] নিউ এজ ৪/১২/১২

৪. সরকারী তদন্ত রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

৫. পোশাক শিল্প বৃহত্তর পরিসরে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও এর নিয়মিত মহড়া উন্নত করতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরী, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে বাধা দেয়া যাবে না। পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষামূলক কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে এবং সরকারকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল মহল তৎপর হলে এই শিল্পকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এ অগ্নিকান্ডের পর অধিকারের তথ্যানুসন্ধান দল অনেকের সঙ্গে কথা বলেন। এঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরা হলো-

মোঃ মোকসেদুল (২৯), কারখানার লোড-আনলোডার

মোঃ মোকসেদুল অধিকারকে জানান, তাঁর বাড়ী গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার কাশদহ গ্রামে। সংসারে অভাবের কারণে তিনি ঢাকায় এসে তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এ কাজ শুরু করেন। তোবা গ্রুপের তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এর ৯তলা ভবনের নিচতলায় ছিল সুতার গোডাউন। কারখানার অষ্টম ও নবম তলা ছিল নির্মাণাধীন। ভবনের ৯তলা থেকে পুরুষ শ্রমিকদের নামার জন্য দক্ষিণ দিকে ১টি সিঁড়ি এবং মহিলা শ্রমিকদের নামার জন্য উত্তর দিকে ২টি সরু সিঁড়ি ছিল। কিন্তু নিচতলায় গিয়ে ৩টি সিঁড়ির গোড়া একত্রে এক সিঁড়িতে পরিণত হয়েছিল। মূল গেটে সব সময়ই তালা লাগিয়ে রাখা হত। তিনি কারখানার নিচতলায় লোড-আনলোডের কাজ করতেন।

২৪ নভেম্বর ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৫.৩০টায় তিনি একতলায় গুদামঘরে পলিথিন মাপছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখেন গোডাউনের মাঝখানে সুতার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই কালো ধোঁয়ায় গোডাউন অন্ধকার হয়ে যায়। কারখানার বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ অফ করায় লাইট বন্ধ হয়ে যায়। তিনি এবং অন্যান্যরা গেট খুঁজে সেখান থেকে বের হয়ে বাইরে চলে আসেন। গোডাউন অন্ধকার হওয়ায় কেউ আগুন লাগার উৎসটি খুঁজতে পারেনি। তিনিসহ কয়েকজন মূলফটক দিয়ে বাইরে আসতে সমর্থ হন। বাইরে বের হয়ে এসে দেখেন ভবনের তিন তলার জানালা দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী নারগিস বেগম তখন ৩য় তলায় সুইং সেকশনে কাজ করছিলেন। তিনি নারগিসকে বাঁচানোর জন্য উৎগ্রীব হয়ে পড়েন। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুনের শিখা ওপরের তলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রায় ৩০ মিনিট পর ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলা থেকে কাঁচের জানালার শিক বাঁকিয়ে এবং ভেঙ্গে শ্রমিকরা ঝাঁপ দিয়ে পড়তে থাকে। এর মধ্যেই ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী এসে পৌঁছালে তিনি পানির পাইপ নিয়ে আগুন নেভাতে সাহায্য করেন এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকাডাকি করেন। রাত আনুমানিক ৮.০০টায় এক লোক তাঁকে জানান, তাঁর স্ত্রী ৩য় তলার জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে পা এবং হাত ভেঙ্গে ফেলেছে। তিনি তখন বাসায় ফেরেন এবং স্ত্রী নারগিস বেগমকে জামগড়ার বেরুনে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে রাত

আনুমানিক ৮.৩০টায় ভর্তি করান। সেখানে ১দিন চিকিৎসার পর টাকার অভাবে নারগিসকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

ভবনের নিচে এক তলা বাড়ী এবং অপর ছবিতে কারখানার অভ্যন্তরে একটি সিঁড়ি (ছবিঃ অধিকার)

নারগিস বেগম (২৫), অপারেটর, সুইং সেকশন

নারগিস বেগম অধিকারকে জানান, ২৪ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.২০টায় ফায়ার সার্ভিসের এলার্ম বেজে ওঠে। তখন তিন তলার শ্রমিকরা আতংকিত হয়ে বের হতে চান। এমন সময় কোয়ালিটি ম্যানেজার দুলাল হোসেন গালিগালাজ করে বলেন, নিচ তলায় কিছুই হয়নি এবং তিনি সবাইকে ধমকিয়ে কাজে মনযোগ দিতে বলেন। শ্রমিকরা আবারও যার যার মেশিনের কাছে যান। কয়েক মিনিট পরেই সিঁড়ি দিয়ে নিচ থেকে কালো এবং গরম ধোঁয়া আসতে থাকে। লাইট নিভে যায় এবং পুরো ফ্লোর অন্ধকার হয়ে পড়ে। তাঁদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে এবং গরম ধোঁয়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়তে থাকেন। এমন সময় তাঁরা সবাই বের হওয়ার চেষ্টা করলেও কেউ আর গরম ধোঁয়ার কারণে সিঁড়ির কাছে যেতে পারেননি। পরে কয়েকজন লোক চেয়ার দিয়ে এবং মেশিনের যন্ত্রাংশ দিয়ে একজস্ট ফ্যান ভেঙ্গে ফেলেন। ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে অনেকেই ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়তে থাকেন। তিনিও তিন তলা থেকে ঝাঁপ দেন এবং নিচে প্রথমে টিনের চালে ও পরে চাল থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়েন। তাঁর ওপরে আরো কয়েকজন আছড়ে পড়েন। তাঁর দুই পা ভেঙ্গে যায়। পাশে আরো কয়েকজন লোক দেখে তিনি অনুরোধ করেন, তাঁর বাসা নিশ্চিন্তপুরে সাত্তার মোল্লার বাড়ী। সেখানে খবর দিলেই তাঁকে কেউ নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে এলাকার আরো কয়েকজন লোক আসে এবং তাঁকে ধরে তাঁর বাসায় নিয়ে যায়। তখন তাঁর স্বামী মোঃ মোকসেদুল এসে তাঁকে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে টাকা না থাকায় তিনি আর চিকিৎসা করাতে পারেননি। তিনি এখন চিকিৎসা করবেন নাকি বাড়ী ভাড়া এবং দোকানে বাকী নেয়ার বিল পরিশোধ করবেন এই দুঃশ্চিন্তায় আছেন। তিনি দুই সন্তান ও স্বামী নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে আছেন।

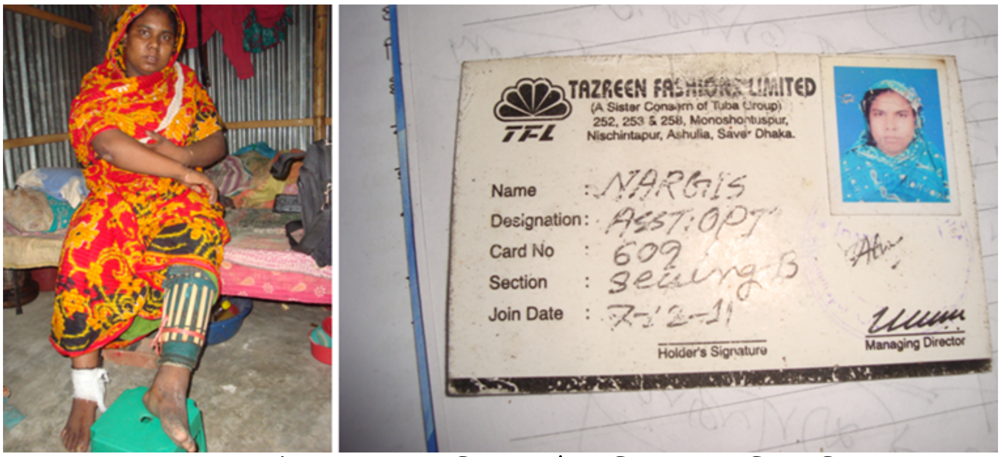

ডান হাত এবং দুই পা ভাঙ্গা নারগিস ও তাঁর পরিচয়পত্র (ছবিঃ অধিকার)

ভাঙ্গা একজস্ট ফ্যান, যেখান দিয়ে নারগিসসহ শ্রমিকরা ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ে (ছবিঃ অধিকার)

শামসুন নাহার মলি (২২), অপারেটর, সুইয়িং সেকশন

শামসুন নাহার মলি অধিকারকে জানান, তিনি সুইং সেকশনে কাজ করেন। কারখানার কর্মকর্তারা প্রত্যেক মাসেই বেতন দিতে গড়িমসি করত এবং দেরিতে বেতন দিত। গত কোরবানীর ঈদে তাঁর ফ্লোরের সবাইকে অর্ধেক বেতন ও অর্ধেক বোনাস দিয়েছে। চলতি মাসে বেতনের বাকী অংশ দেয়ার কথা ছিল।

২৪ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৩০টায় তিনি চতুর্থ তলায় কর্মরত ছিলেন। হঠাৎ ফায়ার সার্ভিসের এলার্ম বেজে ওঠে। ৪র্থ তলা থেকে সবাই বের হওয়ার চেষ্টা করলে সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার রানা বলেন, কিছুই হয়নি। রানা তাঁদের গালিগালাজ করে আবারও কাজে যেতে বলেন এবং উচ্চস্বরে সাউন্ড বক্সে গান চালিয়ে দেন। তিনিসহ সবাই আবারও কাজে ফিরে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিঁড়ি দিয়ে নিচ থেকে ধোঁয়া এসে পুরো ফ্লোর অন্ধকার করে দেয়। লাইট বন্ধ হয়ে যায়। কেউ আর কাউকে দেখতে পারছিলেন না। কারখানার কয়েকজন শ্রমিক পূর্বদিকের একটি জানালার গ্রিল ভেঙ্গে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকেন। তিনিও সেই জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি দেখেন, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুইদিন চিকিৎসা নিয়ে টাকার অভাবে বাসায় ফেরত আসেন। তিনি বুকে ও পিঠে এবং মাথার পেছনে আঘাত পেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতি মাসের বেতন সময়মত না পাওয়ায় ঘর ভাড়া এবং দোকানে বাকী খাওয়ার বিল আটকে আছে।

মোঃ আক্কাস আলী (৩৪), নিহত ফরিদা বেগমের স্বামী

মোঃ আক্কাস আলী অধিকারকে জানান, তাঁর বাড়ী ফরিদপুর জেলার বোয়ালিয়া থানার বলমান্দিয়া পূর্বপাড়া গ্রামে। তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলে মোঃ শান্ত (৮) এবং কন্যা শান্তি আক্তারকে (৫) নিয়ে তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এর পাশে একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন। ২৪ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টায় বাসা থেকে কারখানার দিকে আগুন জ্বলতে দেখেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে দেখেন, তাজরীন গার্মেন্টস এ আগুন জ্বলছে। কিছুক্ষণ পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এলে তিনি আগুন নেভাতে তাঁদের সহযোগিতা করেন। ভবনের দক্ষিণ পাশ দিয়ে ভবন রং করার জন্য বাঁশ বাধা ছিল। তিনি সেই বাঁশ বেয়ে ওপরে ওঠে তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকেন কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে খুঁজে পাননি। ২৫ নভেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা কারখানার ভেতর থেকে অনেকগুলো লাশ বের করে আনেন। যে সব লাশের শুধু মাথা পাওয়া গেছে সেই সব লাশের হিসাব ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা করেছেন। কিন্তু যেসব লাশের শুধু হাত, পা অথবা শরীরের একটি অংশ মাত্র পাওয়া গেছে তার হিসাব তাঁরা করেননি। পরে সেখানে তিনি তাঁর স্ত্রী ফরিদা বেগমের লাশ পান। পরে তিনি লাশ নিয়ে যেয়ে গ্রামের বাড়ীতে দাফন করেন। তিনি জানান, যখন কারখানায় আগুন লেগেছিল তখন গেটে তালা লাগানো ছিল। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকলেও কেউ ব্যবহার জানেন না বলে তার ব্যবহার করতে পারেনি।

ফরিদার পরিচয়পত্র এবং শান্ত ও শান্তাসহ তার স্বামী মোঃ আক্কাস আলী (ছবিঃ অধিকার)

গেটের তালা (ছবিঃ অধিকার)

মোঃ শাহজাহান, পরিচালক, তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড, নিশ্চিন্তপুর, আশুলিয়া, ঢাকা

মোঃ শাহজাহান অধিকারকে জানান, কারখানায় নারী ও পুরুষ মোট শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১১৬৩জন। ২৪ নভেম্বর ২০১২ তে অনুপস্থিত ছিলেন ২৬ জন। উপস্থিত ছিলেন ১১৩৭ জন শ্রমিক। বিকেল আনুমানিক ৫.০০টায় আরো কয়েকজন ছুটিতে চলে গিয়েছিলেন, বাকী শ্রমিক কাজ করছিলেন। তবে আগুনে পোড়ার পর ১১১টি লাশ পেয়েছেন বলে তিনি জানান।

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী দল কারখানার আগুনের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মোঃ আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভির্স ও সিভিল ডিফেন্স, ডি.ই.পি.জেড, সাভার, ঢাকা

মোঃ আনোয়ার হোসেন অধিকারকে জানান, ২৪ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০৫টায় একটি ফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন নিশ্চিন্তপুরের তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডে আগুন লেগেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ৩টি ইউনিট নিয়ে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.১৯টায় তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডে এ পৌঁছান। তিনি দেখেন, আগুন নিচতলা থেকে ৬তলা পর্যন্ত জ্বলছে। আগুনের ভয়াবহতা দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে হেডকোয়ার্টারকে জানান এবং অনুমতি সাপেক্ষে ফায়ার সার্ভিসের সাভার স্টেশন, ধামরাই স্টেশন, মালিবাগ স্টেশন, মোহাম্মদপুর স্টেশন, সদর ঘাট স্টেশন, মিরপুর স্টেশন, টঙ্গী স্টেশন, গাজীপুর স্টেশনকে ঘটনাস্থলে পৌঁছার জন্য খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোট ১৯টি ইউনিট এসে অগ্নিনির্বাপনের কাজে যোগ দেয়। ২৫ নভেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০টায় আগুন পুরো নিয়ন্ত্রণে আসে। রাতেই তল্লাশী চালিয়ে তাঁরা ৩য় তলা থেকে ৬৯টি, ৪তলা থেকে ২১টি এবং ৫ম তলা থেকে ১০টি লাশ উদ্ধার করেন। এছাড়াও আরো কিছু লাশ সেখানে ছিল, যেগুলোর হাত, পা, দেহ ছিন্নভিন্ন থাকায় একত্র করা যায়নি। তবে মাথার খুলি দেখে যতদুর সম্ভব ১০০টি লাশ হিসাব করা গিয়েছিল। ২৫ নভেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় লাশগুলো আশুলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মোঃ বদরুল আলম বুঝে নিয়ে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে দাফনের জন্য হস্তান্তর করেন। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারেন, সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৩০টায় আগুন ধরেছে। তাঁর প্রশ্ন, তাঁকে কেন এত দেরীতে খবর দেয়া হল। শর্টসার্কিট থেকে বা জেনারেটর থেকে অথবা নাশকতামূলক উদ্দেশ্যে এই আগুন লাগানো হতে পারে। তবে তদন্ত না করে কিছুই বলা যাবে না। আগুন কিভাবে লেগেছে তার কোন উৎস তাঁরা পাননি। তবে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির রিপোর্ট পেলেই তা জানা যাবে বলে তিনি জানান।

এসআই মোঃ খায়রুল ইসলাম, আশুলিয়া থানা, ঢাকা

এসআই মোঃ খায়রুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২৪ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টায় এক লোক খবর দেন যে, তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এ আগুন ধরেছে। আগুন দ্রুত সবগুলো ফ্লোরে ছড়িয়ে পড়ে ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১১১জন শ্রমিক মারা যান। তিনি জানান, এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে তিনি বাদী হয়ে দ-বিধির ৩২৩/৩২৫/৪৩৬/৩০৪-ক/৩৪

ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৬২; তারিখঃ ২৫/১১/২০১২। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) মোঃ মোস্তফা কামাল বলে জানান।

মোঃ মোস্তফা কামাল, অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত), আশুলিয়া থানা, ঢাকা

মোঃ মোস্তফা কামাল অধিকারকে জানান, এসআই মোঃ খায়রুল ইসলাম এর ২৫/১১/২০১২ দায়ের করা মামলাটি তিনি তদন্ত করছেন। তবে মৃত্যুর সংখ্যা ১১১ জন বলে তিনি জেনেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন থাকায় তিনি আর কিছু বলতে চাননি।

মোঃ হাবিবুল ইমাম, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বেরুন, জামগড়া, আশুলিয়া, ঢাকা

মোঃ হাবিবুল ইমাম অধিকারকে জানান, ২৪ নভেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টা থেকে তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড থেকে আহত রোগী আসতে থাকে। তাঁদেরকে তাঁরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। মোট ৫৪ জন রোগী আসেন। মধ্যে ৪জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ৩৩জনকে চিকিৎসা দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১৬জন রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। ১ জন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে চলে গেছেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, যাঁদের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, তাঁরা সবাই ওপর থেকে নিচে পড়ে আঘাত পেয়েছিলেন।

মোঃ তৌফিক আহমেদ, এ্যাডমিন অফিসার, নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, আশুলিয়া সরকার মার্কেট, ঢাকা-১৩৪১

মোঃ তৌফিক আহমেদ জানান, ২৪ নভেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড থেকে ৬জন আহত শ্রমিক আসেন। তাঁদের মধ্যে ৪জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ভর্তি না করেই তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। বাকী মৌসুমী আক্তার এবং আছমা খাতুনকে তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। ২৫ নভেম্বর ২০১২ মৌসুমী এবং আছমার অভিভাবকরা এসে তাঁদের হাসপাতাল থেকে নিয়ে যান।

শংকর, ওয়ার্ড ইনচার্জ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

শংকর অধিকারকে জানান, তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এর অগ্নিকা-ের ঘটনায় ৯জন আহত শ্রমিক আসেন। এঁদের মধ্যে একজনকে আইসিইউ বিভাগে এবং বাকীদের ওয়ার্ডে ভর্তি করে এখন চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া আঞ্জুমান মফিদুল থেকে ৫৮টি লাশ ডিএনএ টেষ্টের জন্য আনা হয়েছিল বলে জানান। তিনি এ বিষয়ে আর কিছু জানেন না বলে জানান।

মোঃ আব্দুল হালিম, সহকারী পরিচালক, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, ৪২, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

মোঃ আব্দুল হালিম অধিকারকে জানান, ২৫ নভেম্বর ২০১২ ভোরে ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মোঃ হাবিবুর রহমান জানান যে, তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এ কিছু লাশ আছে। এই খবর পেয়ে লাশগুলো নেয়ার জন্য তিনি ৫টি লাশ বহনকারী গাড়ী নিয়ে তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এ যান। সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় আশুলিয়া থানার ওসি শেখ মোঃ বদরুল আলম মোট ৫৮টি লাশ

বেওয়ারিশ হিসেবে তাঁকে দেন। তিনি লাশ নিয়ে দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় অফিসে ফেরেন। কিন্তু এর মধ্যে পুলিশ সুপার তাঁকে জানান, লাশের ডিএনএ টেস্ট করার ব্যবস্থা করতে হবে। পরে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর একটি বিশেষজ্ঞ দল আসেন। কিন্তু তাঁরা জানান, যেহেতু লাশ বিকৃত হয়ে গেছে, তাই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ লাগবে। তখন পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে লাশগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেয়া হয়। সেখানে আলামত রাখা হয়। পরদিন আত্মীয়স্বজনরা এসে আরো ৫টি লাশ সনাক্ত করে নিয়ে যান।

২৭ নভেম্বর ২০১২ পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসক তাঁকে মোট ৫৩টি লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করতে দেন। যার মধ্যে পুরুষ ৬টি, মহিলা ৪৩টি এবং ৪টি লাশ মহিলা কিংবা পুরুষ হিসেবে সনাক্ত করা যায়নি। তিনি জানান, ২৭ নভেম্বর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মুসলমান ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী প্রথম জানাযা দেন। বিকেল আনুমানিক ৪.৩০টায় লাশ গুলো ঢাকা মহানগরীর জুরাইন কবরস্থানে নিয়ে যান। সেখানে ২য় জানাযা দিয়ে বিকেল আনুমানিক ৫.৩০টায় লাশ গুলো দাফন করেন। তিনি জানান,লাশ গুলোর ডিএনএ রেখে কবরে নাম্বার দেয়া হয়েছে। কেউ চাইলে ডিএনএ টেস্ট করে কবর সনাক্ত করতে পারবেন।

লাশ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। লাশ জুড়াইন কবরস্থানে দাফন করা হচ্ছে। (সৌজন্যে: দৈনিক যুগান্তর)

বিজিএমইএ এর সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী জানান, তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়।

মোঃ মাইন উদ্দিন খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মোঃ মাইন উদ্দিন খন্দকার অধিকারকে বলেন, তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এর ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তিনি কমিটির আহবায়ক। কমিটির সদস্যরা হলেন, শিল্পাঞ্চল পুলিশের মহাপরিচালক মোঃ আবদুস সালাম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আবদুস সালাম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দার। তিনি বলেন, তিনটি কারণ সামনে রেখে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। যেমন, বৈদ্যুতিক গোলযোগ (শর্টসার্কিট), নাশকতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বা মানুষের তৈরি কোনো কারণ। তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে ঘটনার কারণ তাঁরা প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, এতগুলো মানুষের মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। প্রকৃত

অপরাধীদের অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে, কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অগ্নিকা- না ঘটে, সে বিষয়ে সুপারিশ করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, সরকারী হিসেবে ১১১ জন শ্রমিক মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলেন, কারখানায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকলেও ঘটনার দিন একটিও ব্যবহার করা হয়নি। সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে, আগুনের সর্তক সংকেত বাজার পরও কারখানার মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকেরা শ্রমিকদের কারখানা ত্যাগে বাধা দিয়েছেন। ফলে প্রাথমিকভাবে আগুন দেখার পর তা নিয়ন্ত্রণের জন্য একদিকে যেমন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। অন্যদিকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা মালিকপক্ষের লোকজন শ্রমিকদের নিরাপদে বের হওয়ার সুযোগ না দিয়ে বরং কারখানার ভেতরে কাজ করতে বাধ্য করে শত শত শ্রমিককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এমনকি কারখানার মালিকপক্ষ বা কারখানার দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অগ্নিনির্বাপন-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ থাকা স্বত্বেও কেউ সাধারণ অগ্নি-আত্মরক্ষা ও অগ্নিনির্বাপন কৌশল প্রয়োগ করেননি। এ কারণে অগ্নিনির্বাপন-সংক্রান্ত নাশকতা রয়েছে বলে ধারণা করেন তিনি। তিনি বলেন, কারখানার অবস্থান একটি পল্লী গ্রামের ভেতরে। কারখানার সামনের দিকে আট থেকে দশ ফুট রাস্তা। পেছনে তিন দিকে লাগোয়া বাড়িঘর। ফলে এ ধরনের স্থাপনায় স্বাভাবিকভাবেই ফায়ার সার্ভিসের বড় গাড়ি অভিযান চালাতে পারে না। কোনো ধরনের বহির্মুখী জরুরী নির্গমন পথ অথবা বিকল্প সিঁড়ি না থাকায় তৃতীয় ও চতুর্থ তলার শ্রমিকেরা লোহার গ্রিল, জানালার কাঁচ, একজস্ট ফ্যান ভেঙে জীবন বাঁচাতে পাশের গরের টিনের চালে লাফিয়ে পড়েন। তিনি বলেন, ফায়ার সার্ভিসের শর্ত হচ্ছে, কারখানার চারদিক খোলা রাখতে হবে। যাতে চারদিক থেকে আগুন নেভাতে দমকল কর্মীরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন। কারখানার নয়তলা ভবনটির নিচতলার পুরোটাই ছিল গুদাম বা ওয়্যার হাউস। এখানে সুতা ও কাপড় গুদামজাত করা হয়। সেখানে ঢুকতেই একটি সদর দরজা, এরপর নিচতলার ওয়্যার হাউসের ভেতর থেকেই তিনটি সিঁড়ি প্রতিটি তলা ¯র্পশ করে ছাদে গিয়ে মিলেছে। প্রতি তলার প্রবেশমুখেই কলাপসিবল দরজা। নিচতলার ওয়্যার হাউসে আগুন লাগায় এবং সেখান থাকা সিনথেটিক জাতীয় সুতা, কাপড়ের বিশাল মজুদ থাকায় আগুন লাগার পরপরই পুরো ভবনটি ইট ভাটার মতো রূপ নেয় এবং সিঁড়িগুলো হয়ে ওঠে উত্তপ্ত চিমনি। নিচতলার ভয়াবহ আগুনের তাপ, শিখা ও কালো ধোঁয়া তিনটি সিঁড়ি দিয়ে উর্ধ্বমুখী হয়। ফলে শত শত কর্মব্যস্ত শ্রমিকেরা প্রচন্ড কালো ধোঁয়ার বহির্গমনের কোনো পথ না পেয়ে দম বন্ধ ও পরবর্তী সময়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। তিনি বলেন, কারখানার নিচতলায় কোনো ধরনের ওয়্যার হাউস থাকার বিধান না থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি। ফলে আগুন থেকে অনেক বেশি প্রাণহানি ঘটেছে।

চলমনি (২৩), অপারেটর, সুইং সেকশন, তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড, নিশ্চিন্তপুর, আশুলিয়া, ঢাকা

চলমনি অধিকারকে জানান, ২৪ নভেম্বর ২০১২ তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের তৃতীয় তলায় কাজ করছিলেন। সন্ধ্যায় ওভার টাইম করছিলেন। হঠাৎ ফায়ার সাভির্সের এলার্ম বেজে উঠলে ফ্লোরের শ্রমিকরা কারখানা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কারখানার স্টাফরা তাঁদের বের হতে দেননি। তাঁরা আবার কাজ শুরু করলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিঁড়ি ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। পরে একজস্ট ফ্যান ভেঙ্গে তৃতীয় তলা থেকে ঝাঁপিয়ে মাটিতে পড়ে তিনি আহত হন। তিনি বলেন,

এই কারখানায় প্রত্যেক শুক্রবার বা সরকারী ছুটির দিন গুলোতে শ্রমিকদের ছুটি না দিয়ে ওভার টাইম করানো হতো। কেউ ওভার টাইম না করতে চাইলে তাকে কারখানা থেকে বের করে দেয়া হতো। তাছাড়া গত ৪ মাস যাবৎ আন্দোলন করা ছাড়া কখনই ঠিকমত বেতন বা মজুরী দিতো না মালিকপক্ষ। প্রতি মাসের বেতন দেয়ার নির্ধারিত তারিখ থেকে ২/৩দিন পরে তাঁরা বেতন পেতেন। তিনি জানান, তাঁদের কখনই ফায়ার সার্ভিসের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। তিনি জানান, ভবন ও যন্ত্রাপাতির কোন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল না। অগ্নিকা-ের সর্তকতা অবলম্ববনে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকলেও প্রশিক্ষণ না থাকায় কেউ তা চালাতে পারেননি। কলাপসিবল গেটে তালা লাগানো থাকার কারণে শ্রমিকরা বের হতে পারেননি।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ, সহকারী নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব লেবার ষ্টাডিজ-বিলস্

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ অধিকারকে বলেন, বাংলাদেশের শ্রম আইনে একটি কারখানা স্থাপন এবং সেই কারখানার নিরাপত্তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। ওই বিধান বা আইন প্রতিপালনের দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের। কারখানায় কোন আইন কেউ ভঙ্গ করলে দায়ভার মালিককেই নিতে হবে অর্থাৎ আইন ভঙ্গ হলে মালিককেই জবাবদিহিতা করতে হবে। আইন অনুযায়ী তাজরীন ফ্যাশনস এর ভবনটি সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি। সেখানে শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা, তা যে ছিলনা সেটা বেশ সুস্পষ্ট।

তাজরীন ফ্যাশনস এর প্রতিটি ফ্লোর তালাবদ্ধ ছিল, বিকল্প কোন সিঁড়ি ছিল না। সেখানে দাহ্য পদার্থের গোডাউন ছিল, যা থাকতে পারেনা। শ্রমিকদেরকে বের হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। এই অবস্থায় কে দায়ী, কে নাশকতামূলক কর্মকা-ে জড়িত তা বড় কথা নয়। শ্রম আইন না মানার জন্য যে অপরাধ, সে অপরাধের দায়-দায়িত্ব সরাসরি সরকার এবং মালিকপক্ষকেই নিতে হবে। সুতরাং যে অনাকাঙ্খিত ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, সেজন্য পুরো দায়-দায়িত্ব সরকার এবং মালিকপক্ষ যে শ্রম আইন মানেননি সেজন্য মালিককে শাস্তি প্রদানের দায়-দায়িত্ব ছিল সরকারের। যা সরকার করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

যদি নাশকতামূলক ঘটনাই মেনে নিতে হয়, তাহলে তো ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই মালিকপক্ষের থানায় মামলা করা উচিৎ ছিল। শ্রমিকের কোন ক্ষতি হলে মালিক মামলা করবে, এটাইতো নিয়ম, অথচ কোথাও উদ্যোগী হতে দেখা গেল না।

ঘটনার ২ দিন পর তেকে বলা হচ্ছে এটা নাশকতা, তাহলে সেটা নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

প্রথমতঃ মালিকপক্ষ সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের সহায়তায় স্পষ্টতইঃ আইন ভঙ্গ করেছে, শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করার জন্য। সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ মালিকপক্ষের বিচার হতে হবে। শুধুমাত্র শ্রম আইন লঙ্ঘন করার কারণে অসংখ্য শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, যার সংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্ব সরকারী কর্মকর্তা ও মালিকপক্ষের ওপরই বর্তাবে। মালিকপক্ষ পুলিশকে তার কারখানায়

আগুন লাগার ঘটনাটি জানায়নি সেটা একটি অপরাধ। ফায়ার এলার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তর থেকে নামার সুযোগ করে দেয়া উচিৎ ছিল যেটা করা হয়নি। কারখানায় দাহ্য পদার্থ রাখা হয়েছে সেটা আরো একটা অপরাধ।

মালিক সমিতি বিজিএমইএ তাজরীন গার্মেন্টসের মালিকপক্ষ যে অপরাধ করেছে, তার সদস্য পদ প্রত্যাহার করে নেবে এটাই প্রত্যাশা। তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মালিকপক্ষকে শাস্তি প্রদান করা হোক। বর্তমানে বিজিএমইএ যত কথা বলছে, তত কথা বলার অধিকার তাদের নেই। বিজিএমইএ এর যত সার্কুলার বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, তা মালিকরা নিয়মিতই ভঙ্গ করেছে।

উষ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী তাজরীন গার্মেন্টসের প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিককে ৫ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে। মারাত্মক দূর্ঘটনার কারণেই তা দিতে হবে। উষ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করে গার্মেন্টস কারখানাগুলোর ঝুঁকি নিরুপন করতে হবে।

জান্নাত ফাতেমা, শ্রমিক কল্যান কর্মকর্তা, তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড, নিশ্চিন্তপুর, আশুলিয়া, ঢাকা

জান্নাত ফাতেমা অধিকারকে জানান, তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড এ ২৪ নভেম্বর ২০১২ এ অগ্নিকা-ের ঘটনায় অনেক শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। আর অনেকেই আহত হন। তিনি বলেন, সেদিন ১১৩৭জন শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে তিনি জেনেছেন। তবে কতজন পুরুষ বা মহিলা ছিলেন তার হিসাব তাঁর কাছে নাই।

তিনি জানান, কারখানাটি শুরুতে তিন তলা ভবন ছিল। ঢাকা বিভাগীয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর এর ডেপুটি চীফ ইন্সপেক্টর (জেনারেল) মোঃ বেলায়েত হোসেন ইন্সপেক্টর (ইঞ্জিনিয়ারিং) মোঃ মাহফুজুর রহমান তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডকে জি ক্যাটাগরীর কারখানা বলে নকশার অনুমোদন দেন। পরবর্তীতে ৯তলা ভবনের নকশার অনুমোদনও দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স থেকেও ছাড়পত্র দেয়া আছে। তিনি অভিযোগ করেন, আইন অনুযায়ী ঢাকা বিভাগীয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর এর পরিদর্শনের বিধান থাকলেও কোন অফিসার কখনই তা পরিদর্শন করেননি। বরং আবেদন করে খরচের কথা বলে কিছু টাকা দেয়া হলে মোবাইল ফোনে জিজ্ঞাসা করেই অনুমোদন দেয়া হয়। তিনি বলেন, এখন দাবী উঠেছে, কারখানার মালিককে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হোক, তিনিও সেই দাবী সমর্থন করেন। কিন্তু তার আগে ঢাকা বিভাগীয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা এবং ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর কর্মকর্তাকে শাস্তি দেয়া হোক। কারণ তারা অনুমতি না দিলে কারখানা চালু হতো না। যত দিন পর্যন্ত এই কারখানা চলেছে এই সময়ের মধ্যে কোন কর্মকর্তাই কোন অভিযোগ করেননি। তিনি জানান, এই কারখানা থেকে এর আগে শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় চলে গিয়ে শ্রম আদালতে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ১৭টি মামলা করেছেন।

-সমাপ্ত-